নারীর পত্র

বীরবলের মারফত প্রাপ্ত

বাঙালি স্ত্রীলোকের পক্ষে ইউরোপের যুদ্ধের বিষয় মতামত প্রকাশ করা যে নিতান্ত হাস্যকর জিনিস তা আমি বিলক্ষণ জানি, অথচ আমি যে সেই কাজ করতে উদ্যত হয়েছি তার কারণ, যখন অনেক গণ্যমান্য লোক এই যুদ্ধ-উপলক্ষে কথায় ও কাজে নিজেদের উপহাসাস্পদ করতে কুন্ঠিত হচ্ছেন না, তখন নগণ্য আমরাই বা পিছপাও হব কেন।

একথা শুনে হয়তো তোমরা বলবে, পুরুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে তা নয়, অতএব পুরুষের অনুকরণ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনধিকারচর্চা। পুরুষালি-মেয়ে যে একটি অদ্ভুত জীব একথা আমরা মানি, কিন্তু মেয়েলি-পুরুষ যে তার চাইতেও বেশি অদ্ভুত জীব একথা যে তোমরা মানো না তার প্রমাণ তোমাদের কথায় ও কাজে নিত্য পাওয়া যায়।

সে যাই হোক, যুদ্ধসম্বন্ধে যে এদেশে স্ত্রীপুরুষের কোনো অধিকারভেদ নেই সে তো প্রত্যক্ষ সত্য। যুদ্ধ তোমরাও কর না, আমরাও করি নে; পল্টন তোমরাও দেখেছ, আমরাও দেখেছি; কিন্তু যুদ্ধ তোমরাও দেখ নি, আমরাও দেখি নি। এবিষয়ে যা-কিছু জ্ঞান তোমরাও যেখান থেকে সংগ্রহ করেছ, আমরাও সেইখান থেকেই করেছি— অর্থাৎ ইতিহাস-নামক কেতাব থেকে। তবে আমাদের ইতিহাস হচ্ছে রামায়ণ-মহাভারত, আর তোমাদের ইংরেজি ও ফরাসি, ভাষা আলাদা হলেও দুইই শোনা কথা এবং সমান বিশ্বাস্য। লড়াই অবশ্য তোমরা কর, কিন্তু সে ঘরের ভিতর ও আমাদের সঙ্গে, এবং তাতেও জিৎ বরাবর যে তোমাদেরই হয় তা নয়। বরং সত্যকথা বলতে হলে, বাল্য-বিবাহের দৌলতে বালিকা-বিদ্যালয়ের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা হেঁট করেই থাকতে হয়। সুতরাং ইউরোপের এই চতুরঙ্গ-খেলা সম্বন্ধে তোমরা যদি উপর-চাল দিতে পার, তবে আমরা যে কেন পারব না তা বোঝা শক্ত।

কিন্তু ভয় নেই, আমি এ পত্রে কোনোরূপ অধিকার-বহির্ভূত কাজ করতে যাচ্ছি নে — অর্থাৎ তোমাদের মত কোনো উপর-চাল দেব না; কেননা, কেউ তা নেবে না।

আমাদের মতের যে কোনো মূল্য নেই তা আমরা অস্বীকার করি নে; অপরপক্ষে আমাদের অমত যে মহামূল্য, তাও তোমরা অস্বীকার করতে পার না। আমরা তোমাদের মতে চলি, তোমরা আমাদের অমতে চল না। আমাদের 'না'র কাছে তোমাদের 'হাঁ' নিত্য বাধা পায়। আসল কথা, এই অমতের বলে আমরা তোমাদের চালমাৎ করে রেখেছি।

এক্ষেত্রেও তাই আমি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মত নয়, অমত প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছি, কেননা, 'যুদ্ধ কর'— একথা যদি পুরুষে জোর করে বলতে পারে, তা হলে 'যুদ্ধ কোরো না'— একথা জোর করে বলতে স্ত্রীলোকে কেন না পারবে? আমরা কাপুরুষ না হলেও না-পুরুষ তো বটেই।

যুদ্ধ যে কস্মিন্‌কালে কোনো দেশে স্ত্রীলোকের অভিপ্রেত হতে পারে না, এবিষয়ে বেশি কথা বলা বৃথা। যুদ্ধ-জিনিসটি চোখে না দেখলেও ব্যাপারখানা যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। বঙ্গভাষার মহাকাব্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পড়া যায় আসল ঘটনা অবশ্য তার অনুরূপ নয়। ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক মিলে আজ যে খেলা খেলছে সে আর-যাই হোক ছেলেখেলা নয়। সূর্যগ্রহণ-ভূমিকম্প-ঝড়জল-অগ্ন্যুৎপাতের একত্র-আবির্ভাবে পৃথিবীর যেরকম অবস্থা হয়, এই যুদ্ধে ইউরোপের তদ্রূপ অবস্থা হয়েছে। এই মহাপ্রলয়গ্রস্ত কোটি-কোটি নরনারীর মৃত্যুযন্ত্রণার ও প্রাণভয়ের আর্তনাদ আমাদের কানে অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পৌছয়; সম্ভবত তা তোমাদের শ্রুতিগোচরই হয় না। অপর কোনো কারণ না থাকলেও এই এক কারণে মানুষের হাতে-গড়া এই মহামারী-ব্যাপার আমাদের কাছে চিরকালের জন্য হেয় হয়ে থাকত। মায়ের-জাত এমন করে লোক-কাঁদাবার কখনোই পক্ষপাতী হতে পারে না। আমরা নবজীবনের সৃষ্টি করি, সুতরাং সেই জীবন রক্ষা করাই আমাদের মতে মানবের সর্বপ্রধান ধর্ম এবং তার ধ্বংস করা মহাপাপ। তার পর, এই মহাপাপের সৃষ্টি করে পুরুষে, আর তার পুরো শাস্তি ভোগ করি আমরা। অতএব যুদ্ধ-ব্যাপারটি আমাদের কি প্রকৃতি, কি স্বার্থ, উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

তোমরা হয়তো বলবে যে, যুদ্ধের প্রতি স্ত্রীজাতির এই সহজ বিদ্বেষের মূলে কোনোরূপ যুক্তিসংগত কারণ নেই। সেই কারণে পুরুষে যুদ্ধ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে বাধ্য। পৃথিবীর বড় বড় জিনিসের ঔচিত্যানুচিত্য কেবলমাত্র হৃদয় দিয়ে যাচাই করে নেওয়া যায় না। এসব ঘটনার সার্থকতা বোঝবার জন্য বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই।

বিদ্যা যে আমাদের নেই, সে তো তোমাদের গুণে; কিন্তু সেইজন্যে বুদ্ধি যে আমাদের মোটেই নেই একথা আমরা স্বীকার করতে পারি নে। কারণ, ও ধারণাটি তোমাদের প্রিয় হলেও সত্য নয়। সুতরাং যুদ্ধ করা সংগত কি অসংগত— তা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করতে বাধ্য।

যুদ্ধের সকল সাজসজ্জা সকল রংচং ছাড়িয়ে দেখলে দেখা যায় যে ও-ব্যাপারটি হত্যা ও আত্মহত্যা ব্যতীত আর-কিছুই নয়। অথচ এটি প্রত্যক্ষ সত্য যে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, পরকে মারা কিংবা নিজে মরা সে উদ্দেশ্য নয়।

মানুষ পশু হলেও যে হিংস্রপশু নয়, তার প্রমাণ তার দেহ। আমরা হাতে পায়ে মুখে মাথায় অস্ত্রশস্ত্র ধারণ ক'রে ভূমিষ্ঠ হই নে, তোমরাও হও না। মানুষের অবশ্য নখদন্ত আছে, কিন্তু সে নখ ভালুকের নয় এবং সে দাঁত সাপের নয়। অনেকের অবশ্য মস্তকে গোজাতির মগজ আছে এবং অনেকের দেহে গণ্ডারের চর্ম আছে, কিন্তু তাই বলে এ অনুমান করা অসংগত হবে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ললাটে শৃঙ্গ এবং নাসিকায় খড়্গ ছিল। শুনতে পাই যে, আদিম মানবের বৃহৎ লাঙ্গুল ছিল, বর্তমানে ও অঙ্গটি অনাবশ্যকবিধায় সেটি আমাদের দেহচ্যুত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি যথার্থ মানবধর্ম হয় তা হলে পুরুষ-মানুষের, অন্তত বীর-পুরুষের, মাথার শিং এবং নাকের খাঁড়া খসে পড়বার কোনো কারণ ছিল না। মানুষের কেবল একটিমাত্র ভগবদ্দত্ত মহাস্ত্র আছে— সেটি হচ্ছে রসনা। সুতরাং মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ঐ অস্ত্রের সাহায্যেই করা তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্তব্য।

তার পর, মানুষ যে আত্মহত্যা করবার জন্য এ পৃথিবীতে আসে নি, তার প্রমাণ মানুষের সকল কাজ, সকল যত্ন, সকল পরিশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনধারণ করা। ওই এক মূল-প্রবৃত্তি হতে মানুষের শুধু সকল কর্মের নয়, সকল ধর্মেরও উৎপত্তি। ইহজীবনের পরিমিত সীমা অতিক্রম করবার অদম্য প্রবৃত্তি থেকেই মানুষে দেহাতিরিক্ত আত্মা এবং ইহলোকাতিরিক্ত পরলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। এই কারণে, যে কর্মের দ্বারা জীবনরক্ষা সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট যথার্থ কর্তব্যকর্ম এবং যে ধর্মের চর্চায় আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট গ্রাহ্যধর্ম। তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত দর্শন-বিজ্ঞান হাজার প্রমাণাভাব দেখালেও মানুষের মন থেকে যে ধর্মবিশ্বাস দূর হয় না তার কারণ মস্তিষ্ক মজ্জার বিকারমাত্র, মজ্জা মস্তিষ্কের বিকার নয়। এবং বাঁচবার ইচ্ছা মানুষের মজ্জাগত। মানুষের কাছে সব জিনিসের চাইতে প্রাণের মূল্য অধিক বলেই প্রাণবধ-করাটাই মানবসমাজে সবচাইতে বড় পাপ বলে গণ্য।

এই কারণেই 'অহিংসা পরমধর্ম'— এই বাক্যটিই ধর্মের প্রথম না হোক, শেষ কথা। এই কথাটি সত্য ব'লে গ্রাহ্য ক'রে নিলে যুদ্ধের সপক্ষে বলবার আর-কোনো কথাই থাকে না। একের পক্ষে অপরকে বধ করা যদি পাপ হয় তা হলে অনেকে মিলে অনেককে বধ করা যে কি ক'রে ধর্ম হতে পারে তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যে গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য অকর্তব্যকে যোগ দিয়ে একটি মহৎ কর্তব্যে পরিণত করা হয় সে শাস্ত্র আমাদের জানা নেই।

যুদ্ধের মূল যে হিংসা এবং বীরত্ব যে হিংস্রতার নামান্তরমাত্র, সেবিষয়ে অন্ধ থাকা কঠিন।

বীরপুরুষ-নামক জীবের সঙ্গে অবশ্য আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই। যাত্রাদলের ভীম আর থিয়েটারের প্রতাপাদিত্য হচ্ছে আমাদের বীরত্বের আদর্শ। কিন্তু রঙ্গভূমির বীরত্ব এবং রণভূমির বীরত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা প্রভেদ আছে। কেননা, অভিনয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে আমোদ দেওয়া আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে পীড়ন করা। সুতরাং আসল বীররস যে-পরিমাণে করুণ-রসাত্মক নকল বীররস সেই-পরিমাণে হাস্য-রসাত্মক। এর এক থেকে অবশ্য অপরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যেসকল গুণের সমবায়ে বীরচরিত্র গঠিত হয় তার একটি বাদ আর সব গুণই আমাদের শরীরে আছে ব'লে বীরত্বের বিচার করবার পক্ষে আমরা বিশেষরূপে যোগ্য।

শুনতে পাই, ধৈর্য হচ্ছে বীর্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এ গুণে তোমাদের অপেক্ষা আমরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রত নিয়ম উপবাস জাগরণে আমরা নিত্যঅভ্যস্ত, সুতরাং কষ্ট-সহিষ্ণুতা আমাদের অঙ্গের ভূষণ; বিনা-বিচারে বিনা-ওজরে পরের হুকুমে চলা নাকি যোদ্ধার একটি প্রধান ধর্ম। এ ধর্ম আমাদের মত কে পালন করতে পারে? আমাদের মত কলের পুতুল জর্মানির রাজকারখানাতেও তৈরি হয় নি। তার পর, কারণে কিংবা অকারণে অকাতরে প্রাণ দেওয়া যদি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা হয়, তা হলে আমরা বীরশ্রেষ্ঠ; কারণ তোমাদের পিতামহেরা যখন জ্বরে মরতেন সেইসঙ্গে আমরা পুড়ে মরতুম। এসব গুণ সত্ত্বেও যে আমরা বীরজাতি বলে গণ্য হই নি তার কারণ আমরা পরের জন্য মরতে জানি কিন্তু পরকে মারতে জানি নে। যে প্রবৃত্তির অভাব-বশত স্ত্রীধর্ম হেয়, আর সদ্ভাববশত ক্ষাত্রধর্ম শ্রেয়— সে হচ্ছে হিংসা। বীরপুরুষ কিছুই সাধ করে ত্যাগ করতে চান না; সবই গায়ের জোরে ভোগ করতে চান। শাস্ত্রে বলে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। বীরের ধর্ম হচ্ছে, পৃথিবীর সুবর্ণ-পুষ্প চয়ন করা; অবশ্য আমরাও তার অন্তর্ভূত। তাই আমাদের সঙ্গে বীরপুরুষের চিরকাল ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ। বীর প্রাণ দান করতে পারেন না, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে দৈবাৎ তা হারান তো সে তাঁর কপাল আর তাঁর শত্রুর হাতযশ। বীরত্বের মান্য আজও যে পৃথিবীতে আছে তার কারণ বীরত্ব মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক করে, শ্রদ্ধার নয়। সুতরাং যুদ্ধের মাহাত্ম্য মানুষের বল নয় দুর্বলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে কাজ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, মানুষের ভীরুতাই যার মূলভিত্তি, যে কর্মের ফলে সমাজের অশেষ ক্ষতি হয়— তা যে কি করে ধর্ম হতে পারে তা আমাদের ধর্মজ্ঞানে আসে না।

পুরাকলে পুরুষ-মানুষে যুদ্ধ-করাটাই ধর্ম মনে করতেন এবং স্ত্রীলোকে চিরকালই তা অধর্ম মনে করত। কালক্রমে পুরুষের মনেও এবিষয়ে ধর্মাধর্মের জ্ঞান জন্মেছে। এখন যুদ্ধ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক ধর্মযুদ্ধ আর-এক অধর্মযুদ্ধ। শুনতে পাই, এ

কার্যের ধর্মাধর্ম তার কারণের উপর নির্ভর করে। সভ্যজাতির মতে আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ, একমাত্র তাই ধর্ম— বাদবাকি সকল কারণেই তা অধর্ম। এ মতের প্রতিবাদ করা অসম্ভব হলেও পরীক্ষা করা আবশ্যক। কেননা, কথাটা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। এই দেখ না, ইউরোপে কোনো জাতিই এই যুদ্ধের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে চান না এবং পরস্পর পরস্পরকে অধর্মযুদ্ধ করবার দোষে দোষী করছেন, অথচ এঁরা সকলেই সভ্য, সকলেই বিদ্বান ও সকলেই বুদ্ধিমান। এই মতভেদের কারণ কি এই নয় যে, আত্মরক্ষা-শব্দের অর্থটি তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। 'আত্ম'-শব্দের অর্থ কে কি বোঝেন আত্মজ্ঞানের পরিসরটি কার কত বিস্তৃত— তার দ্বারাই তাঁর আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসারও নির্ণীত হয়। পরদ্রব্যে যে মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মাতে পারে তার প্রমাণ পৃথিবীতে বহু ব্যক্তি এবং বহু জাতি নিত্যই দিয়ে থাকেন। সুতরাং কোন্ পক্ষ যে শুদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছেন আর কোন্ পক্ষ যে শুদ্ধ পরদ্রোহিতার জন্য যুদ্ধ করছেন, নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে তা বলা কঠিন।

আত্মরক্ষা-শব্দের অবশ্য একটা জানা অর্থ আছে; সে হচ্ছে আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজের প্রাণ ও নিজের ধন রক্ষা করা, এবং সে ধনও বর্তমান ধন, ভূত কিংবা ভবিষ্যৎ নয়। কেননা, গত ধন পুনরুদ্ধার কিংবা অনাগত ধন আত্মসাৎ করবার জন্য পরকে আক্রমণ করা দরকার।

পৃথিবীর সকল জাতিই যদি উক্ত সহজ ও সংকীর্ণ অর্থে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর-কোনো কারণে যুদ্ধ করতে গররাজি হন, তা হলে যুদ্ধ কালই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কেউ যদি আক্রমণ না করে তো আর-কাউকেও আত্মরক্ষা করতে হবে না। যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হওয়াই যদি পুরুষজাতির মনোগত অভিপ্রায় হয়, তা হলে নিরস্ত্র হওয়াই তার অতি সহজ উপায়। সুতরাং যতদিন দামামা-কাড়া ঢাল-তলোয়ার গুলি-গোলা ইত্যাদি সভ্যতার সর্বপ্রধান অঙ্গ হয়ে থাকবে, ততদিন আত্মরক্ষা করা যে যুদ্ধের একমাত্র কিংবা প্রধান কর্তব্য একথা বলা চলবে, কিন্তু মানা চলবে না।

আসল কথা, যুদ্ধের দ্বারা আত্মরক্ষা করা দুর্বল জাতির পক্ষে অসম্ভব এবং প্রবল জাতির পক্ষে অনাবশ্যক।

দুর্বলের পক্ষে ও-উপায়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করার অর্থ আত্মহত্যা করা। হাতে-হাতে প্রমাণ— বেলজিঅম।

যুদ্ধ আমাদের মতে একমাত্র সেই-ক্ষেত্রে ধর্ম যে-ক্ষেত্রে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপে, দুর্বল এই উপায়ে আত্মরক্ষা নয়, আত্মবিসর্জন করে। উদাহরণ— বেলজিঅম।

সত্যকথা বলতে গেলে মানুষে হয় অর্থের জন্য নয় প্রভুত্বের জন্য, হয় রাজ্যের জন্য নয় গৌরবের জন্য পরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। পরার্থনাশ এবং স্বার্থসাধনের জন্যই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়। যুদ্ধের মূলে আত্মজ্ঞান নেই, আছে শুধু অহংজ্ঞান। যুদ্ধের উৎপত্তি থেকেই তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যুদ্ধ যে ধর্মকার্য এ প্রমাণ করতে হলে তৎপূর্বে 'হিংসা পরম ধর্ম' এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তোমরা অবশ্য এ কর্তব্যকার্যে পরাঙ্মুখ হও নি। বুদ্ধের ধর্ম যে বুদ্ধির ধর্ম নয় এই প্রমাণ করবার জন্য, শুনতে পাই, বুদ্ধিমান পুরুষে নানা দর্শন ও বিজ্ঞান রচনা করেছেন।

বাংলার মাসিকপত্রের প্রসাদে এসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধানগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরাও লাভ করেছি। দেশের ও বিদেশের এইসকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের, মাথার না হোক, বুকের মাপ আমরা নিতে জানি। বড়-বড় কথার আড়ালেও তোমাদের হৃদয়বিকার আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তাই তোমাদের দর্শনবিজ্ঞানে তোমাদের ঠকাতে পারে, আমাদের পারে না।

শুনতে পাই, অক্লান্ত গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষ পুচ্ছবিষাণহীন হলেও পশু। এবং যেহেতু পশুর জীবন সংগ্রামসাপেক্ষ অতএব দুর্বলের উপর আক্রমণ এবং প্রবলের নিকট হতে পলায়ন করাই মানুষের স্বধর্ম। ছল ও বল প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ তার অন্তর্নিহিত মানসিক ও শারীরিক শক্তির পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারে। সুতরাং পশুত্বের চর্চা করাই হচ্ছে যথার্থ মনুষ্যত্বের চর্চা করা। যে-সভ্যতা নিষ্ঠুরতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে-সভ্যতা শক্তিহীন ও প্রাণহীন; কেননা, হিংসাই হচ্ছে জীবজগতের মূলসত্য। এবং সেই সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ধর্ম। হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘাতপ্রতিঘাতই মানবের উন্নতির একমাত্র কারণ; এবং নিজের নিজের উন্নতি সাধন করাই যে পরম পুরুষার্থ— সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমরা অজ্ঞযুগের উত্তরাধিকারীশর্তে যেসকল নীতিজ্ঞান লাভ করেছি তার চর্চায় মানুষকে শুধু দুর্বল করে। সুতরাং নবনীতির বিধান এই যে, নির্মমভাবে যুদ্ধ কর, অবশ্য দুর্বলের সঙ্গে।

এতটা নগ্ন সত্য মানুষে সহজে বুকে তুলে নিতে পারে না; কেননা, তা তার যুগসঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যায়। সাধারণ লোকের সে পরিমাণ বুদ্ধিবল নেই, যাতে করে জীবজগতে অবরোহণ করাই যে আরোহণ করবার একমাত্র উপায়— এ সত্য সহজে আয়ত্ত করতে পারে। তাছাড়া, সকলের সে পরিমাণ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি নেই যার সাহায্যে নিজের বুকের ভিতর হিংস্র পশুর সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে।

সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে সাধারণের নিকট গ্রাহ্য করাতে হলে তাকে ধর্ম ও নীতির সাজে সজ্জিত করে বার করা দরকার। অতঃপর বৈজ্ঞানিকরা সেই উপায়ই অবলম্বন করেছেন।

সুনীতির ছদ্মবেশধারী বৈজ্ঞানিক মত এই। প্রতি লোক নিরীহ হলেও তাদের সমষ্টিতে সমাজ-নামক যে বিরাটপুরুষের সৃষ্টি হয়, সে একটি ভীষণ জীব। এই বিরাট-পুরুষের প্রাণ আছে আত্মা নেই, রতি আছে বুদ্ধি নেই, গতি আছে দৃষ্টি নেই। সমাজ শুধু বাঁচতে চায় ও বাড়তে চায়, এই তার জীবনের ধর্ম; অন্য-কোনো ধর্মাধর্ম তাকে স্পর্শ করে না। সমাজ হচ্ছে একমাত্র অঙ্গী এবং ব্যক্তিমাত্রেই তার অঙ্গ। সুতরাং ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের অধীন কিন্তু সমাজ কোনো ব্যক্তিবিশেষের অধীন নয়। এবং যেহেতু সমাজের বাইরে আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, সে কারণ সমাজকে রক্ষা করা এবং তার অভ্যুদয়সাধন করাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। সহস্র সহস্র লোকের আত্ম-বলিদানের ফলে এই বিরাটপুরুষের দেহ পুষ্ট হয়। লোকে বলে যে, যে মণ্ডপের আঙিনায় লক্ষ বলি হয়, সেখানে একটি কবন্ধভূত জন্মায়, যার নরবলি ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা যায় না; এবং সে বুভুক্ষিত থাকলে গৃহস্থের ঘাড় মটকে খায়। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সমাজনামক বিরাটপুরুষ এই জাতীয় একটি প্রেতযোনি বই আর-কিছুই নয়। এই বিরাট-কবন্ধের শোণিত-পিপাসা নিবারণার্থ নরবলি দেওয়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে যতগুলি বিভিন্ন সমাজ আছে, ততগুলি পৃথক বিরাটপুরুষও আছে। এবং এইসকল নরমাংস-লোলুপ দৈত্যদের মধ্যে চিরশত্রুতা বিদ্যমান। সুতরাং মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য— নিজ-সমাজের নিকট পর-সমাজকে বলি দেওয়া, অর্থাৎ যুদ্ধ করা। এই মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকরা মানবের নৈতিক বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, শুধু তার বিকার সাধন ক'রে সেটিকে বিপথে চালাতে চান। এঁদের সাদা কথা এই যে, নিজের স্বার্থের জন্য করলে যে কাজ মহাপাপ, জাতীয় স্বার্থের জন্য করলে সেই একই কাজ মহাপুণ্য। সমাজ-নামক অপদেবতাকে নিবেদন করে দিলে খুন জখম চুরি ডাকাতি ফুলের মত শুভ্র দীপের ন্যায় উজ্জ্বল ধূপের ন্যায় সুরভি হয়ে ওঠে। বহু মানবকে একত্রে যোগ দিলে কি ক'রে একটি দানবের সৃষ্টি হয় তা আমাদের স্ত্রীবুদ্ধির অতীত। আর এইকথাটা জিজ্ঞাস্য থেকে যায় যে, লোকসমষ্টিকে সমাজ নাম দিয়ে তার উপরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করার যদি কোনো বৈধ কারণ থাকে তা হলে এই ব্যক্তিটির অন্তরে একটি আত্মার আরোপ করা কি কারণে অবৈধ? এই বিরাটপুরুষকে মানবধর্মী কল্পনা করলে আমাদের সহজ ন্যায়বুদ্ধিকে ডিগবাজি-খাওয়ার জন্য তোমাদের আর এত গলদ্ঘর্ম হতে হত না।